বিশেষ সাক্ষাৎকার । পিটার কাস্টার্স

বুদ্ধিজীবী ও সমাজবদলের কর্মী পিটার কাস্টার্সের জন্ম ১৯৫০ সালে, হল্যান্ডের ছোট্ট শহর রুরমণ্ডে। ১৯৭৩ থেকে '৭৬ সাল পর্যন্ত *পিপলস ডেইলি, দ্য নিউ আমস্টারডামস*সহ হল্যান্ডের প্রধান জাতীয় দৈনিকগুলোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। তেভাগা আন্দোলনে নারী, এশীয় বাজারে পুঁজি ও নারী শ্রম, নারীবাদী তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা-বই লিখেছেন। বাংলাদেশের ফ্ল্যাড অ্যাকশন প্লানের (ফ্যাপ) পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে যে দুটি সম্মেলন হয়েছে, তার সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেছেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বর্তমানে ইইউ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থায় বাংলাদেশের পক্ষে ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

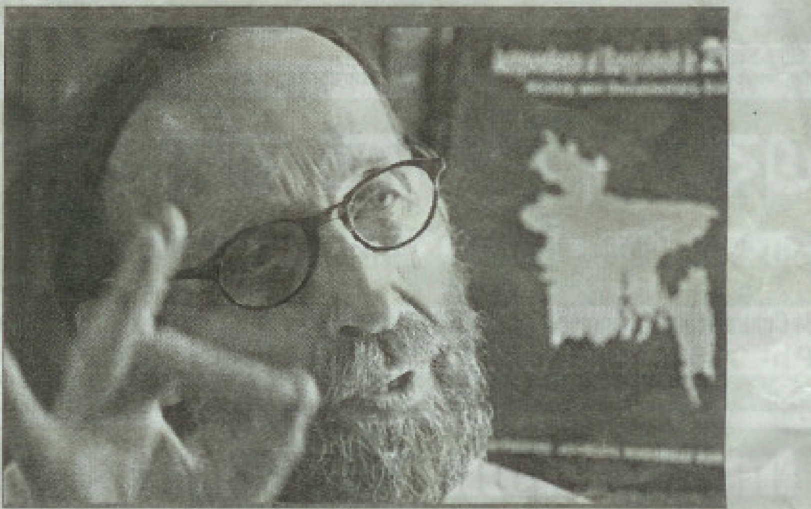

● সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ইফতেখার মাহমুদ**

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের এখনই উপযুক্ত সময়

প্রথম আলো ● একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কী?

পিটার কাস্টার্স ● বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তার প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সংহতি জানাতেই আমার বাংলাদেশে আসা। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও এই বিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের বাংলাদেশি দোসরদের গণহত্যা মানবতার বিরুদ্ধেও একটি বড় অপরাধ। মানবজাতির অংশ হিসেবে আমরা এর বিচার দেখতে চাই। তবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) সমর্থন আদায়ের বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য জরুরি। কেননা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশ যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশকে চাপ দিতে পারে, যেখানে বাংলাদেশের অনেক শ্রমিক কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্র এই বিচারের পক্ষে কোনো অবস্থান নেবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ফলে এই বিচারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করতে হলে বাংলাদেশকে ইইউর সমর্থন পেতে হবে। ইইউ সমর্থন দিলে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সমর্থন আদায় সহজ হবে। এ ক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতা থাকলেও কূটনৈতিক পর্যায়ে চেষ্টা করলেও তা কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব নয়।

প্রথম আলো ● বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচারকে অনেকে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উদ্যোগ হিসেবে মনে করে।

পিটার কাস্টার্স ● একাত্তর সালে যেসব রাজনৈতিক দল যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী প্রধান। তারাই গণহত্যাকারীদের সংগঠন আলবদর ও আলশামস গঠন করেছিল। রাজনৈতিকভাবে জামায়াত সব সময়ই ফ্যাসিবাদী শাসনের সমর্থক ছিল। পাকিস্তানের সামরিক শাসন, আশির দশকে এরশাদের স্বৈরশাসনেরও সমর্থক ছিল জামায়াত। জামায়াতের রাজনৈতিক আদর্শ হচ্ছে ধর্মীয় অনুভূতি কাজে লাগিয়ে মানুষের মনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা। স্বাধীনতার বিরোধিতা করা এই দলটি স্বাধীন বাংলাদেশে বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। তাদের যে আর্থিক ও সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে, তা অন্য যেকোনো দলের চেয়ে ভালো। মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ ঠেকাতে হলে জামায়াতে ইসলামীকে আগে ঠেকাতে হবে।

প্রথম আলো ● জামায়াত তো গণতান্ত্রিক শাসনামলে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হয়েছে। দেশের অন্যতম প্রধান দলও তারা।

পিটার কাস্টার্স ● জামায়াতের মতো একটি ফ্যাসিবাদী দলের সঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ঐক্য করা উচিত হয়নি। কেননা তারা যখনই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার হয়েছে, তখনই সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। এসবের পক্ষে তারা সব সময়ই যুক্তি দিয়েছে। বিএনপি-জামায়াতের শাসনামলে সাধারণ মানুষের ওপর জেএমবির নেতা সিদ্দিকুর রহমান বাংলা ভাইয়ের নির্যাতন শুরু হলে তা সরকার থেকে প্রথমে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু পরে বাংলা ভাইয়ের উত্থানের পেছনে জামায়াতের ভূমিকা জানা গেছে। সবগুলো মৌলবাদী দল ও জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জামায়াতের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে।

প্রথম আলো ● জামায়াতকে ফ্যাসিবাদী দল বলছেন কেন?

পিটার কাস্টার্স ● ইউরোপের ফ্যাসিবাদী দলগুলোর সঙ্গে জামায়াতের আচরণের মিল রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজিরা পরিকল্পিতভাবে পুরো একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী ও জাতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। এটাই ফ্যাসিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধ বা সংঘাতের সময় মানুষের মৃত্যু আর ফ্যাসিবাদী গণহত্যার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজিরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পরিকল্পিতভাবে মানুষ হত্যা করত। একাত্তরের গণহত্যা, নিরীহ মানুষের বাড়িতে আগুন লাগানো, আলবদর ও আলশামস বাহিনী তৈরি করে তাদের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যার পেছনে জামায়াত ছিল। ২০০১ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপর যে হামলা হয়েছে তখনো অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিল তারা। এরশাদের সামরিক শাসনের সুযোগে তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস ও নির্যাতনের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তাদের এসব কর্মকাণ্ড খুব পরিকল্পিতভাবে করেছিল। গণহত্যা ও নির্যাতন করে তারা সব সময়ই যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছে। পরবর্তী সময়ে আবার তা অস্বীকারও করেছে। এই আচরণের সঙ্গে ফ্যাসিবাদের মিল রয়েছে। হল্যান্ডসহ ইউরোপের বহু দেশে এ ধরনের ফ্যাসিবাদী দল রয়েছে।

প্রথম আলো ● আওয়ামী লীগ ও বিএনপিও তো একে অপরের প্রতি অসহিষ্ণু আচরণ করে। সরকার সব সময় বিরোধী দলের ছাত্র, শ্রমিকসহ সব সংগঠনের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করে থাকে।

পিটার কাস্টার্স ● বিরোধী দলের ওপর হামলা ও নির্যাতনকে আমি বলব অগণতান্ত্রিক আচরণ। জনমত, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের চাপে তারা অনেক সময় এ ধরনের অসহিষ্ণু আচরণ থেকে সরে আসে। আলোচনার মাধ্যমেও অগণতান্ত্রিক আচরণ থেকে তাদের সরিয়ে আনা যায়। তবে এ কথাও বলব, তাদের চিন্তার কাঠামো এত কঠিন যে তারা কখনো নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসে না। যুক্তি-তর্ক ও চাপ দিয়েও কোনো কাজ হয় না। নিজেদের মতাদর্শ ছাড়া বাকি সবাইকে তারা ভুল হিসেবে চিহ্নিত করে। এটি গণতন্ত্রের সহায়ক নয়।

প্রথম আলো ● যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সঙ্গে ফ্যাসিবাদী শক্তিকে মোকাবিলা করার প্রসঙ্গটি যুক্ত করতে গেলে জটিলতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে কি না?

পিটার কাস্টার্স ● এই দুটি বিষয়কে অবশ্যই একসঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি, ফ্যাসিবাদী শক্তির সঙ্গে আলোচনা না করে তাদের নিষিদ্ধ করা উচিত। তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি উচ্ছেদ এবং রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তির উন্মেষ ঘটানোও জরুরি। গণতান্ত্রিক দলগুলো যদি নিয়মিতভাবে অগণতান্ত্রিক আচরণ শুরু করে, তাহলে ফ্যাসিবাদী শক্তি বিকশিত হয়। আমার সঙ্গে আপনার মতের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তাকে ভুল হিসেবে প্রমাণ করে দমন করার চেষ্টা করা ঠিক নয়।

প্রথম আলো ● আন্তর্জাতিকভাবে তো জামায়াত যথেষ্ট শক্তিশালী।

পিটার কাস্টার্স ● বাংলাদেশের ভেতরে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেই জামায়াত ক্ষান্ত হয়নি, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তারা প্রভাব ও যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। লন্ডনে তাদের শক্ত ঘাঁটি রয়েছে। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে জামায়াত যুদ্ধাপরাধের বিপক্ষে সেমিনার করছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যখন আক্রমণের শিকার হয়, তখন তারা পুরোনো মতাদর্শ ও বিশ্বাসকে আগলে ধরে রাখতে চায়। লন্ডনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা এ কারণে ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠনগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। জামায়াত লন্ডনে মসজিদ স্থাপন করে সেখান থেকে তহবিল সংগ্রহ করছে। লেবার পার্টিসহ সেখানকার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে জামায়াতের লোক ঢুকে পড়েছে। ইতালিতেও বাংলাদেশিদের সংখ্যা বাড়ছে। জামায়াত সেখানেও তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম বিস্তারের চেষ্টা করবে। যেসব প্রবাসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চান তাঁদের এবং মুক্তিযুদ্ধ ও প্রগতিশীল মানুষকে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে। বাংলাদেশ সরকারেরও উচিত প্রবাসীদের কাজে লাগিয়ে ইউরোপে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা, সেখানকার সরকারগুলোর ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী সংগঠন ও সংস্থাগুলোর কাছে বিষয়টি তুলে ধরা।

প্রথম আলো ● বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে কতটুকু সফল হবে বলে মনে করেন?

পিটার কাস্টার্স ● বর্তমান সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে প্রভাবশালীরা এ ব্যাপারে আন্তরিক। সরকারের বাইরে বুদ্ধিজীবীরাও সরকারকে এ ব্যাপারে জনমত তৈরি ও আইনি সহায়তা দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে সম্প্রতি ঢাকায় যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে গেল, তাতে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য হেলমুট কোল ও সুইডেনের পার্লামেন্ট সদস্য সেসিলিয়া উইকস্ট্রম এসেছিলেন। দুজনই ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। তাঁরা বাংলাদেশকে যুদ্ধাপরাধের বিচারের পক্ষে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব বুদ্ধিজীবী এসেছিলেন, তাঁরা আন্তর্জাতিক পরিসরে যথেষ্ট প্রভাবশালী। তাঁরা যুদ্ধাপরাধের বিচারের পক্ষে জনমত তৈরি করবেন বলে বাংলাদেশ সরকারকে আশ্বাস দিয়েছেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনেও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের রাজনৈতিকভাবে বর্জন করেছে বলে মনে হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি যথেষ্ট অনুকূলে রয়েছে। সরকার আন্তরিকভাবে এগিয়ে গেলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্ভব। তবে যুদ্ধাপরাধের বিচারকে আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করতে হলে সাবধানে এগুতে হবে। কেননা এ নিয়ে বেশ কিছু জটিলতাও রয়েছে।

প্রথম আলো ● কী ধরনের জটিলতা?

পিটার কাস্টার্স ● মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে ইইউর কঠোর অবস্থান। নতুন কোনো দেশ ইইউর সদস্য হতে চাইলে তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন করে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করার শর্ত দেওয়া হয়েছে। মানবাধিকারের প্রশ্নে তারা মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে তা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করা কঠিন হবে। ফলে বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে অনেক সতর্কভাবে এগোতে হবে।

প্রথম আলো ● এ ব্যাপারে আপনার অবস্থান কী?

পিটার কাস্টার্স ● আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, যুদ্ধাপরাধের বিচারে কারও মৃত্যুদণ্ড হলে সেটি ঐতিহাসিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত হবে। কেননা যুদ্ধাপরাধ মানবতাবিরোধী অপরাধ। এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে গণহত্যার পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

প্রথম আলো ● ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সমর্থন পেতে বাংলাদেশ কী করতে পারে?

পিটার কাস্টার্স ● ইউরোপীয় পার্লামেন্ট একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে দুবার রেজুলেশন নিয়ে নীতিগত অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার কোনো ফলোআপ হয়নি। বাংলাদেশের সুযোগ রয়েছে ইইউকে এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া। ইইউর কাছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে নীতিগত অবস্থান ঘোষণা করার দাবি তুলতে হবে। ইইউ মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে তাদের বোঝাতে হবে এটি সাধারণ অপরাধ নয়। গুরুতর অপরাধ। এই বিষয়টিতে যদি তাদের আপত্তিও থেকে থাকে তাহলে আলোচনার মাধ্যমে বাকি বিষয়ে সমর্থন আদায় সম্ভব করা যাবে বলে আমার ধারণা।

প্রথম আলো ● আপনাকে ধন্যবাদ।

পিটার কাস্টার্স ● ধন্যবাদ।